... আমি কী ভুলিতে পারি?

কাইউম পারভেজ

আজ একুশে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সাল। তেষট্টি বছর আগে ঠিক এই দিনে কয়েকজন যুবক বুকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঙ্গীন করেছিলেন মায়ের মুখের ভাষার দাবীতে। সেই সাথে রোপন করেছিলেন স্বাধীনতার বীজ। তেষট্টি বছর পর ঠিক এই দিনেই আজ ঢাকাসহ দেশের কোন এক রাজপথে হয়তো পেট্রোল বোমায় ঝলসে উঠছে কারো না কারো অবুঝ শরীর। রঙ্গীন হচ্ছে রাজপথ। হয়তো তার মনের বিরুদ্ধে অবুঝ শরীরটাকে টেনে তুলেছে ওই মরার বাসে। মরার পেট ওকে মরার বাসে নিয়ে এসেছে। এই পেটের তাগিদ না থাকলে তো ওকে মরার বাসে উঠতে হতো না। তেষট্টি বছর আগে ওরা প্রাণ দিয়েছিলো মায়ের ভাষার মুক্তির প্রয়োজনে। তখন গোটা দেশের মানুষ (কিছু জামায়াত আর মুসলিম লীগার ছাড়া) সবাই এক। এখন গোটা দেশের মানুষ দুই, তিন, চার বহুধা বিভক্ত। ১৯৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারীটাও এতো ভয়ার্ত, দহন-দাহনে নির্মম ছিল না। তেষট্টি বছর পর মনে হয় দেশটা যেন ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই একইভাবে থমকে আছে। তখন শত্রু ভীনদেশী। এখন শত্রু ঘরের। শত্রু ভিতরেই। মনে হয় না আমরা স্বাধীনতার দীক্ষায় দীক্ষিত - ভালবাসার শিক্ষায় শিক্ষিত। যদি ভালবাসতে পারতাম তবে কী করে টোকাইয়ের একহাতে দুশো টাকা আর হাতে পেট্রোল বোমা দিয়ে বলতে পারতাম - যা মাইরা দিয়ায়। দূর থেকে দেখতাম পরমতৃপ্তি নিয়ে বাসভর্ত্তি মানুষ চিৎকার করছে আর পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে। মানুষ পোড়ানোর এ মহৌৎসব এ বাংলায় কখনো হয়নি। মানুষ পুড়িয়ে মারার অধিকার প্রদান করার জন্য বরকত সালাম রফিকউদ্দীন শফিক জব্বাররা প্রাণ দেয়নি। প্রাণ দেয়নি স্বাধীনতার বীর শহীদেরা গনতন্ত্রের নামে মানুষ পোড়ানোর লাইসেন্স দেবার জন্য। আজ ৪৮ দিন ধরে মানুষ পুড়ছে । এক বছরের শিশু থেকে সত্তর বছরের বৃদ্ধ সবাই পুড়ছে। পুড়তে পুড়তে ষাটের অধিক এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে।

বায়ান্ন, একাত্তরে যারা ছিল শত্রু তেষট্টি বছর পর সেই তারাই এখনো শত্রু। আর সেই চেনা শত্রুগুলোকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে আমরাই জিইয়ে রেখেছি জলজ্যান্ত মানুষ পোড়ানোর জন্য। ওদেরকে চিরতরে নিঃশেষ করার জন্য বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বিচার চলছে। সেই থেকেই ওরা বেপরোয়া। ওদের বেপরোয়াত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন গুলোর। প্রশ্রয় দিচ্ছে তারা যারা আজ ক্ষমতা হারা। ফলে সবার এজেন্ডা ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্য এক। তা হলো যে কোন উপায়ে এ সরকারকে উৎখাত করা। নইলে জঙ্গী সন্ত্রাসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার তো চলতেই থাকবে। নইলে কোনভাবেই তো আর ক্ষমতায় ফিরে যাওয়া যাবে না।

যার যার এজেন্ডা মাফিক কাজ হচ্ছে। শুধু জীবন দিয়ে দগ্ধ হয়ে মাশুল গুনছে হতভাগ্য বাসযাত্রী চালক হেল্পার আর মাইশার মায়ের মত হতভাগিনীরা। যশোরের ঘোপে বাড়ী মাইশাদের। মাইশা যশোর পুলিশ লাইন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা ঠিকাদারী করেন। আর সেকারণেই গিয়েছিলেন কক্সবাজারে। মাইশা আবদার ধরেছে কখনো সমুদ্র দেখেনি। একমাত্র আদুরে মেয়ের আবদার ফেলতে পারেন নি। অগত্যা মাইশার মাকেও নিতে হলো। মাইশার মা যাবেন না কেন? নইলে চোখের সামনে দেখবে কে স্বামী আর মেয়ে বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকার করছে? তারপর আস্তে আস্তে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেলো। মা শুধু দেখছেন বাসভর্ত্তি লোক পুড়ছে। তিনি নিজেও বাসের মধ্যে ছিলেন। কেমন করে কখন নিজের পোড়া শরীর নিয়ে নিচে ছিঁটকে পড়েছেন নিজেই জানেন না। একসময় আগুন স্তিমিত হলো। লাশের পোড়া গন্ধে বাতাস ভারী হলো। হতবিহ্বল মাইশার মা ভাঙ্গা পোড়া ঝলসানো স্মৃতির বাক্সটা নিয়ে ঘোপের খোপে চলে গেলেন। কক্সবাজারে সমুদ্রের জলোচ্ছাসও যদি স্বামী কন্যাকে নিয়ে যেত মনকে হয়তো বুঝ দিতে পারতেন। যদি একাত্তরের খানসেনা বা রাজাকারের হাতে মৃত্যু হতো তবুও বুঝ দিতে পারতেন। যদি বায়ান্নর সেই অবাঙালি পুলিশ হতো তাহলেও বুঝ দিতে পারতেন। এ যে তার দেশের মানুষ - তাঁর স্বজন। ছুঁড়ে দিলো একটা বোতল। নিমিষে তাঁর পৃথিবীটা বদলে গেলো।

... ... এমন শতেকের উপর গল্প আছে এবার একুশেতে আপনাদের উপহার দেবার। আশ্চর্য - এর পরও আমরা বসে আছি। আমরা একাত্তরে রুখে দাঁড়াতে পেরেছি অথচ এভাবে অর্ধ শতকের উপর মানুষ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়লো - আরো শতেক বার্ণ ইউনিটে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। আমরা বসে আছি কেমন করে? আমরা কবে এর শেষ দেখবো? আমরা কবে হুংকার দিয়ে উঠবো - খামোশ..!

আমি জানি না আজ মাইশার মা কী করে গাইবেন - আমার ভায়ের রক্তে রাঙ্গানো ..... আমি কী ভুলিতে পারি? নাকি তিনি গাইবেন - আমার মেয়ের আগুন জড়ানো ... আমি কী ভুলিতে পারি?